ইসলাম ও মওদুদীবাদ -১

১৯২৪ সালে নবীজীর নারীদের নিয়ে ‘‘রঙ্গীলা রসুল’’-এর প্রকাশক রাজপাল খুন হল কলকাতায়, ১৯২৬ সালে ক্যালিগ্রাফার আবদুল রশিদ রাগে উন্মত্ত হয়ে শুদ্ধি-অভিযানের নেতা স্বামী শ্রদ্ধাননন্দকে খুন হবার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমানেরা নিপীড়িত হল, দিল্লীতে মওলানা জওহর বক্তৃতায় কেঁদে বুক ভাসালেন এই বলে যে, হিন্দুদের মোকাবেলায় মুসলমানের মধ্যে কোন আলেম নেই, সেই বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত হয়ে তেইশ বছরের তরুণ মওদুদী ছ’শো পৃষ্ঠার বিশাল লেখা লিখে সারা ভারতে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলেন, তা আর থামল না উনসত্তর সালে তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত। ততদিনে তাঁর বাণী ভারতবর্ষের গন্ডী পার হয়ে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে গেছে। আনুষ্ঠানিক কোন উচ্চশিক্ষা ছিলনা তাঁর কিন্তু মেধাবী ছিলেন তিনি। তাঁর লেখায় প্রতিফলিত তাঁর স্বচ্ছতা, শক্তিশালী বলার ভঙ্গী, আবেগের অসাধারণ প্রয়োগ, শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসের কারুকার্য্য ইসলামি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিটি বাধাকেই তিনি প্রচন্ডবেগে আঘাত করেছেন। এমনকি, তাঁর ইসলাম কেউ না মানলে সে কম মুসলমান অথবা মুসলমানই নয়। আইনের ডান্ডা দিয়ে সে ইসলাম প্রয়োগ করা হবে, প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেয়া বা মেরে ফেলা হবে।

মৌদুদী স্পষ্ট মানুষ। যা বুঝেছেন, ভুল হোক শুদ্ধ হোক সুস্পষ্ট বলেছেন। যা বলেছেন, তা করতে চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক ইসলামের দর্শনকে উপস্থাপিত করেছেন প্রচন্ড গতিতে, তীব্র উর্দু ভাষায়। তাঁর প্রতিটি ভাষণ যেন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। এ ছাড়াও তৎকালীন ভারতের মুসলমান সমাজের পরাজিত অবস্থা, মুসলিম-নেতৃত্বের দুর্বলতা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঔপনিবেশিক পটভুমি, মধ্যপ্রাচ্যের নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন সবকিছুই কাজ করেছে তাঁর সাফল্যের পেছনে। সেই পরাজিত মুসলিম সমাজে অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিলনা তাঁর দেখানো শারীরিক শক্তিশালী জাতি হবার অলীক লোভ, অপরাধহীন নিপীড়নহীন সমাজের অসম্ভব চিত্র এবং দুনিয়ার মোড়ল হবার অবাস্তব স্বপ্নের প্রভাবে না পড়া। এত তীব্র গতিতে ছুটেছেন যে তিনি খেয়াল করেন নি তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যগুলো (১) পরস্পর-বিরোধী হয়ে যাচ্ছে, (২) কোরাণ-হাদিসের মুখ্য বিষয় এড়িয়ে গৌণ বিষয়-ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে মারাত্মক হল (৩) কোরাণের ঐতিহাসিক চরিত্র ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সত্য অস্বীকার করেছে। রাজনৈতিক ইসলামকেই তিনি মূল ইসলাম মনে করেছেন এবং সে হিসেবে নিজেকে ‘‘নওমুসলিম’’ও বলেছেন। এ সত্য তিনি প্রবলভাবে অস্বীকার করেছেন যে বিভিন্ন মতের মুসলিমরাও ওই কোরাণ-হাদিস থেকেই নিজের নিজের সমর্থন দেখায়। সবাই বলে শুধু তারটাই ঠিক, সব দলেরই সমর্থক আছে, সবেতেই কোরাণ-হাদিসের সমর্থন দেখানো সম্ভব।

শুরুটা হল, রেল-ষ্টেশনে এক মুসলিম প্রজা তার হিন্দু জমিদারকে প্রণাম করছে দেখে তিনি দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন এই মনে করে যে আগামী দশ বছরের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে যাবে ভারতীয় মুসলমানেরা সামগ্রিকভাবে নিশ্চিহ্ন হবে কি হবে না। ওটার আসল কারণ আর্থসামাজিক অভিঘাত তা তিনি বোঝেন নি। স্যার আবদুর রহিম, ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নওয়াব খাজা পরিবার, ফরিদপুরের স্যার আবদুল লতিফের মতো মুসলিম জমিদারদের প্রজারাও ওই একইভাবে প্রণাম করে তা না বুঝে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সততার সাথেই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তাঁর এ উদ্বেগ প্রথমতঃ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে ‘‘মুসলমানদের প্রতি বিশ্বব্যাপী পর্থিবীর সব অমুসলিমের আক্রমণ’’ এই অবাস্তব অনুমানের প্রতিরোধ খুঁজে বের করতে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এক তৃতিয়াংশ জনগণ (ভারতের মুসলমান) নিশ্চিহ্ন হতে পারেনা তা তিনি বোঝেন নি, মানব সমাজের চলমান বিবর্তনের অগ্রগতিকে দেখার দুরদৃষ্টিও তাঁর ছিলনা। মৌদুদীর (এবং জামাতেরও) বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, দুনিয়ার সমস্ত অমুসলিমরা চাকরি-ব্যবসা বাদ দিয়ে অন্ধকার ঘরে বিশ্ব-মুসলিমের বিরুদ্ধে ফিসফিস করে ষড়যন্ত্র করা ছাড়া আর কিছুই করছে

না। এই অবাস্তব বিশ্বাসের উৎকন্ঠা মৌদুদী ও তাঁর অনুসারীদের নিয়ে গেছে আরেক অবাস্তব জগতে। দুনিয়ায় কোটি কোটি অমুসলিম আছেন যাঁরা মুসলিম-দরদী, এ সত্য তাঁদের লেখায় পাওয়া কঠিন। অথচ পশ্চিমা বিশ্বের দয়ার দান বা সার্টিফিকেট নিতে মৌদুদী-জামাতের আগ্রহ প্রচুর। ‘‘ধর্মহীন তাগুত’’-এর দেশ-মেশিন-ওষুধ ছাড়াও তাঁদের চলেনি বা চলেনা। নবীজী কাউকে খলিফা বলে যান নি, সমাজকে দিয়ে গিয়েছিলেন গণ-প্রতিনিধির নেতৃত্ব। সেই রত্ন নষ্ট করে যারা রাজা-বাদশাহ হয়ে মুসলিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই সৌদী রাজার হাত থেকে পুরষ্কার নিতেও মৌদুদীর বাধে নি। এসব আত্ম-প্রতারণা জামাতিরা না দেখুক, আমরা ঠিকই দেখেছি।

ভারতীয় মুসলিম সমাজকে মওদুদী যে শক্তি-সাফল্যের লোভ দেখিয়েছেন, তা উঠে এসেছে সমস্ত অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা থেকে। শেষে ‘‘আক্রমণই প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায়’’ এই মনস্তাত্বিক ফাঁদে তিনি নিজেও পড়েছেন, অন্যদেরও ফেলেছেন। এ আক্রমণের সমর্থনে তিনি মুসলিম উম্মাকে ‘‘পার্টি’’ হিসেবে উপস্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। ‘‘পার্টি’’ শব্দটার জন্য কোরাণ নাকি ‘‘উম্মা’’ শব্দটা ব্যবহার করেছে। হজরত আবু বকর (রাঃ) নাকি মুসলিম পার্টির ভার নিয়েছিলেন, জামাত নাকি আসলে আল্লার কাজ করার ‘‘পার্টি’’-ইসলামে জিহাদ পৃষ্ঠা ১০। এভাবেই তিনি ইসলামের নামে ভাবের গরুকে গাছে তুলিয়ে ছেড়েছেন। এ বিশ্বাসের পর মওলানা নবীজীকে তিনি সামরিক আক্রমনকারী দেখাতে বাধ্য হলেন। ‘‘ইসলামে জিহাদ’’ বইয়ের পৃষ্ঠা ২৩:- ‘‘পরে চারপাশের দেশগুলিতে নবী (দঃ) ইসলাম গ্রহনের আমন্ত্রন পাঠান। যখন ওই দেশগুলির শাসনকর্তারা তাঁর আমন্ত্রন অস্বীকার করিল, তখন নবী (দঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ব্যবস্থা গ্রহন করিলেন’’। কারণ, ৬ পৃষ্ঠা থেকে - ‘‘ইসলাম দেশ-জাতি নির্বিশেষে ইসলামের দর্শন ও কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী সকল রাষ্ট্র ও সরকারকে পৃথিবী হইতে ধ্বংস করিতে চায়’’। বিশ্বের অমুসলমানের বিরুদ্ধে একটা অঘোষিত যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। চিরকালই কিছু মানুষ ধর্মপালনের আগ্রহে অত্যন্ত উদগ্র, অন্যের ওপরে অত্যাচারের মাত্রাটাই সওয়াবের মাত্রা মনে করে তারা। মৌদুদী ও তাঁর অনুসারীরা এর মধ্যে পড়েন। এ অন্ধত্ব এতই ভয়াবহ যে, নিজেরই মা-বোনের আর্তনাদ-হাহাকার মর্মে পৌঁছে না। এরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে বিশেষতঃ নারীর ওপরে নেমে আসে কেয়ামত।

মওলানার আক্রমণাত্মক হবার কারণ আছে। তাঁর হায়দ্রাবাদে তখন শতকরা ৯০ ভাগ অমুসলিমের চাপে শতকরা ১০ ভাগ মুসলিম একেবারে চ্যাপ্টা, ভারতের রাজনীতি ও দাঙ্গায়ও মুসলিমরা হিন্দুদের চাপে চ্যাপ্টা। সুবিশাল কংগ্রেসের মোকাবেলায় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় তেমন শক্তিশালী কোন সর্বভারতীয় দল নেই, বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টি। মুসলিম লীগ (১৯০৫ সালে ঢকায় বানানো) তখনো চতুর জিন্নার নেতৃত্ব পায় নি, তখনো তার হালে পানি নেই। কাজেই মওলানার দর্শন আত্মরক্ষামুলক হতে হতে স্বাভাবিকভাবেই শেষে আক্রমণাত্মক হয়ে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গেছে। তিনি তাঁর ‘‘এ সর্ট হিষ্ট্রি অফ দি রিভাইভালিষ্ট মুভমেন্ট ইন ইসলাম’’ বইয়ের ৮ পৃষ্ঠায় স্পষ্টই বলেছেন:-‘‘এই (ইসলামি) সরকারের কার্য্যপ্রণালী এমন যে ইহাতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের বিশেষ অবকাশ নাই’’। অথচ কোন ধর্মীয় রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্ভবই নয়। তাঁর ইসলামী-গণতন্ত্রের কথাটাও ভিত্তিহীন, শব্দটা একটা সুগভীর ষড়যন্ত্র মাত্র। তারিখ আল্ তাবারির ৯ম খন্ডের শেষ পৃষ্ঠাগুলো এবং ১০ম খন্ডের প্রথম তিন পৃষ্ঠায় এ হাঁড়ি হাটের মধ্যে ভেঙে দেয়া আছে। আসলে কোনো ধর্মরাষ্ট্রেই গণতন্ত্র সম্ভব নয়। ‘‘দি ইসলামিক ল’ অ্যান্ড কনষ্টিটিউশন’’ বইয়ের ১৩৮ -১৩৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেনঃ-‘‘রাজনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিতে ইসলাম পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সম্পুর্ন বিরোধী। ইসলামে পশ্চিমা গণতন্ত্রের লেশমাত্র নাই’’। বহু পরে তিনি এ বক্তব্য থেকে সামান্য সরে এসেছেন কিন্তু সেটা ছিল শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত। ক্রমাগতভাবে তিনি তাঁর দার্শনিক অন্ধত্ব প্রকাশ করেছেন এই বলে যে তাঁর ইসলামি ব্যাখ্যার বাইরে দুনিয়ার সবাই ও সবকিছুই তাগুত বা বাতিল, ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা, ইসলামী সরকার ছাড়া যে কোন সরকার হল ধর্মহীন, দুর্নীতিবাজ, অসৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর বই-বক্তৃতায় স্ববিরোধীতার অন্ত নেই। যেমন, - শারিয়ার মুরতাদ-হত্যার আইন কোরাণ-বিরোধী

তা সবাই জানে, বিশ্ব-জামাতি ডঃ জামাল বাদাওয়ী ও ডঃ ইউসুফ কারযাভী (কারযাভী আগে মুরতাদ-হত্যার পক্ষে ছিলেন) পর্য্যন্ত তা স্বীকার করেছেন। অথচ মওদুদী কোরাণ-লংঘনকারী এ আইনের পক্ষে যুক্তি খুঁজে এনেছেন নবিজীর প্রায় হাজার বছর পর লেখা কাঞ্জুল উম্মাল-এর কাটা-ছেঁড়া সুত্র থেকে। আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

তিনি বলেছেন - "দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের কোনই তফাৎ নাই" - হিউম্যান রাইট্স্ ইন ইসলাম - পৃষ্ঠা ১২। এদিকে তিনি এ-ও বলেছেন "যে ব্যাপারে কোরাণ ও রসুলের প্রত্যক্ষ নির্দেশ আছে তা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান একমত হলেও বিন্দুমাত্র বদলাতে পারেব না" - ইসলাম ল' অ্যান্ড কনষ্টিটিউশন - পৃষ্ঠা ১৪০। অথচ শারিয়ায় একই ব্যাপারে (সাক্ষ্য, খুনের রক্তমুল্য ইত্যাদি) মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে নির্লজ্জ ফারাক আছে। কিংবা ধরুন, কোনো অমুসলিমকে খুন করলে মুসলিম খুনীর মৃত্যুদন্ড হবে না (সুত্র - দি পেনাল ল' অফ ইসলাম- পৃ-১৪৯, ইন্টারনেটের সহি হাদিস সুনান আবু দাউদ-এর ১৪-২৭৪৫ অংশে এবং শারিয়ার মূল কেতাব "রিসালা"র ১৪২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। এতগুলো সুত্রের মূল সুত্র হল সহি বোখারী - খন্ড ৪-এর হাদিস নম্বর ২৮৩, ডঃ মুহসিন খানের অনুবাদ। সেটার আবার শেকড় হল - ৬২২ সালে নবীজী যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনি একটা শান্তিচুক্তি করেছিলেন মদিনার ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে। চুক্তিটায় মোট সাতচল্লিশটা ধারার একুশ আর চোদ্দ নম্বর ধারায় আছে ঃ- "কেহ যদি কোন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে ও তাহা প্রমাণিত হয়, তবে নিশ্চয়ই খুনীর মৃত্যুদন্ড হইবে" (ধারা ২১) কিন্তু "কোন অবিশ্বাসীকে খুন করার বদলে কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে খুন (ইয়াক্তালু) করিবে না" -(ধারা ১৪) - দি ফার্ষ্ট রিটেন কনষ্টিটিউশন ইন দি ওয়ার্লড, পৃষ্ঠা ৪৫ ও ৪৭- মুহম্মদ হামিদুল্লাহ - ১৯৪১। এ দলিল যে জাল এবং নবিজীর নয় তার শক্তিশালী পরোক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ, এ ক্ষেত্রে "গঠনতন্ত্র" শব্দটাই ভুয়া। শব্দটার একটা সাংগঠনিক-রাজনৈতিক মাত্রা আছে যা সাম্প্রতিক, অতিতের নয়। চোদ্দশ' বছর আগে যখন রাষ্ট্রব্যবস্থাই জন্মায়নি তখনকার একটা শান্তিচুক্তিকে "গঠনতন্ত্র" নাম দেয়াটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, বিস্তারিত দেয়া আছে আমাত সাইটে - **BanglarIslam.com**। তা ছাড়া মদীনায় তখন মোটামুটি দশ হাজার লোকের বাস (ঐ - হামিদুল্লাহ ১৯৪১-পৃষ্ঠা ১৩), আর মুসলমানের সংখ্যা মাত্র দু'শো-(দি প্রসেস অফ ইসলামিক রেভল্যুশন-মৌদুদি পৃঃ ৪২)। অর্থাৎ মুসলিমরা শতকরা মাত্র দুই আর অমুসলিমরা আটানব্বই। শতকরা আটানব্বই জনগণ নিজেদেরই দেশে বসে নিজেদেরই বিরুদ্ধে এই অন্যায় অপমানকর চুক্তিতে কেন রাজী হবে বিদেশী মাত্র দুই জনের সাথে? প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া এমন অন্যায় চুক্তি বানানো রহমতুল্লিল আল্ আমিনের পক্ষে তো দুরের কথা, কোন বিবেকবান নেতার পক্ষেও সম্ভব নয়।

অনেক ইসলামী দার্শনিকের চোখে তাঁর দর্শনের ভিত্তিহীনতা, অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, অমানবিকতা এবং ভবিষ্যতের ভয়াবহ সর্বনাশা কুফল ঠিকই ধরা পড়েছিল। প্রতিষ্ঠানের অভাবে মৌদুদী-বিরোধীদের কথাগুলো জনগণের কানে পৌঁছয়নি, এদিকে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে মেধাবী মওদুদী ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। এ পর্য্যন্ত সেটা বহুগুণে বেড়ে উঠেছে। এই এত বছর পরেও জামাতকে ইসলামী দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিহত করার কোন সংগঠন নেই। যে কোন সংগঠনের পাল্টা, বিপ্রতীপ, সমান্তরাল ও বিরোধী সংগঠন দু'দলের জন্যই দরকার। এতে সবারই ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে এবং মানবসমাজের অগ্রগতিতে সুবিধে হয়। এর বাস্তব সুবিধে জামাত এড়িয়ে গেছে চিরকাল। চিন্তার সংঘর্ষ হল সভ্যতার অগ্রগতির মূল উপাদান। কিন্তু মুখে আলাপ-আলোচনা-ইজিহাতদের বন্যা বইয়ে দিলেও ভিন্নমতের সাথে আলাপ তো দুরের কথা বরং আলোচনাকে "বিতর্ক" নাম দিয়ে নিষেধ করা আছে। আমরা চার-চারবার জামাতকে জনসমক্ষে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছি, নিউইয়র্কের সাপ্তাহিকে খোলা চিঠি ছাপিয়েছি, - কোনই কাজ হয় নি। গো-আজম স্পষ্টই বলেছেন গত ৪ জানুয়ারী দৈনিক ইনকিলাব-এ -"জামাত কোন ইসলামি দল ও নেতার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়না....... কারো মন্তব্যের প্রতিবাদে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে জামাত সময় ও শ্রমের অপচয় মনে করে"। বলা বাহুল্য, আমরা

আলোচনার আহ্বান জানিয়েছি, - বিতর্কের নয়। সে ভালই জানে আলোচনা হলেই মুখোস খুলে তাঁর ইসলাম-বিরোধী চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়বে। এটাও এসেছে মৌদুদী থেকেই। প্রতিপক্ষের সাথে উন্মুক্ত প্রত্যক্ষ আলোচনায় না গিয়ে মৌদুদী তাদেরকে বলেছেন "তোমাদের রাগেই তোমরা মর।" (ঐ, ৪ই জানুয়ারী '০৬) এটা একান্তই একটা হিংসুক নীচমনের কথা, কোন দার্শনিক নেতার কথা হতে পারে না। এতে সমস্যার সমাধানের বদলে খুন-খারাপী অবধারিত। এটা নবীজীর সুন্নতেরও ঘোর খেলাফ, তিনি কোনদিনই কারো সাথে আলোচনায় না করেন নি। বস্তুতঃ যে কোন বিরোধ-মীমাংসার মূল ভিত্তিই হল আলোচনা। নবিজীকে পর্য্যন্ত কোরাণ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে প্রশ্নকারীকে উৎসাহিত করেছে, "প্রশ্নকারীকে ধমক দেবেন না" -আদ্ব-দ্বোহা আয়াত ১০।

ইসলাম নিয়ে মৌদুদী কি যে অসম্ভব জগাখিচুড়ি করেছেন তার আর তুলনা নেই। তাঁর যে কোন দশ-বারোটা বই, কোরাণ, বোখারি-তাবারি-ইবনে হিশাম'ইশাক এবং হানাফি-শাফি' শারিয়া বইগুলো একসাথে খুলে দেখলেই বোঝা যায় তিনি তাঁর দর্শনে তিনি মোটেই সংহত ছিলেন না। একবার এটা বলছেন তো পরেই তার উল্টোটা বলছেন বহু-বহুবার, বহু-বহুবার তিনি প্রতিটি ইসলামি মূল কেতাবকে লংঘন করেছেন। সেজন্যই দুনিয়ার বহু ইসলামি বিশেষজ্ঞ তাঁর প্রবল বিরোধীতা করেছেন। তাঁর ভেতরে সেই সাথে যোগ হয়েছে স্পর্ধা - দুনিয়ার কে কি করতে পারবে ও পারবে না তা তিনিই ঠিক করছেন। ভাবখানা এই যে তিনি সবার মাথা কিনে নিয়েছেন, কিন্তু সে অধিকার তাঁর কোত্থেকে এল তা বলেন নি। কোন দার্শনিক এভাবে হুংকার দেয় না যেভাবে তিনি দিয়েছেন। কোনো জামাতি আলোচনায় এলে এগুলো উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে পারতাম।

যাহোক, জনসমক্ষে আলোচনায় তত্ত্ব-তথ্য-বাস্তব উদাহরণ দিয়ে জামাতকে ইসলাম-বিরোধী প্রমাণ করা খুবই সম্ভব। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন তাতেই জামাত উচ্ছেদ হয়ে যাবে তবে বড় ভুল হবে। জামাত তার আর্থিক-সাংগঠনিক কাঠামো এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে যদি গুটিকয় জামাতি ছাড়া দেশের প্রতিটি মানুষও জামাতকে চরমভাবে ঘৃণা করে তবু সে শক্তভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাদের অসৎ রাজনীতি ও ভগ্ন প্রতিষ্ঠানের দেশে কিভাবে সে উচ্ছেদ হবে তা এখনও বলা সম্ভব নয়। তবে অনেক কারণেই তার ললাটে চরম পরাজয় সুনিশ্চিত, তার মধ্যে তিনটে হল ষড়যন্ত্র, কোরাণ-লংঘন ও মানবাধিকার লংঘন।

ওগুলো না হয় তত্ত্বকথা। বাস্তব কাজে-কর্মে জামাতিদের মধ্যে আমরা আজ যে মারাত্মক হিংস্রতা দেখি তারও মূল রয়ে গেছে মৌদুদীর অপদর্শনেই। একাত্তরে গ্রাম-গঞ্জে স্বজাতিরই লক্ষ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম হরণ ও সাধারণ মানুষ হত্যায় মৌদুদীর দল যে নৃশংসতা করেছে, - তা-ও আবার ইসলামের নামে, দুনিয়ায় তার তুলনা বিরল। মৌদুদী তখনও বেঁচে, কসাইয়ের মত তিনি বাংলায় এই পাশবিক গণধর্ষণ-গণহত্যায় সমর্থন জুগিয়ে গেছেন। ১৯৫৩ সালে তাঁরই লিফ্লেটের ভিত্তিতে লাহোরে তিন দিনে নারী-শিশু-বৃদ্ধ সহ প্রায় পনেরো হাজার আহমদী কচুকাটা হয়। একটা ছোট শহরে জল্লাদের হুংকার আর প্রতিদিন পাঁচ হাজার আশরাফুল মাখলুকাতের হত্যাযজ্ঞ কি ভয়াবহ ব্যাপার তা জামাতিদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় বলেই এতবড় কেয়ামতের পরেও তিনি কোনোদিন একটু দুঃখপ্রকাশ পর্য্যন্ত করেন নি। জামাত তাঁরই পদাংক হুবহু অনুসরণ করেছে গণহত্যা-গণধর্ষণ করার পর "একাত্তরে আমরা ভুল করিনি" বলে। লাহোর-গণহত্যার দায়ে মৌদুদীর মৃত্যুদন্ড পর্য্যন্ত হয়। পরে তাঁর জিগরী দোস্ত মধ্যপ্রাচ্যের চাপে তিনি ছাড়া পান। তখন পাকিস্তান ও মুসলিমের "ঘোর বন্ধু" অ্যামেরিকাও তাঁকে "পাকিস্তানের সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক" বলেছে- নীচে দলিল দেখুন।

> এ বিপদ এখন পাকিস্তানকে পচিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে উদয় হয়েছে প্রেতের বিভৎসতায়।
> কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তান নয়, আফগানিস্থান তো নয়ই।

পৃষ্ঠা: ৫

হাসান মাহমুদ
টরন্টো।
ক্যানাডা।

DECLASSIFIED
Authority NND 842430
By AL NARA Date 10/30/04

CONFIDENTIAL-SECURITY INFORMATION

TELEGRAM SENT

ACTION & FILE COPY.

TO: SECSTATE
WASHINGTON

DATE: May 12, 1953

NO.: 1711

CODE:
CONFIDENTIAL - SECURITY INFO.

CHARGED TO: Regular

SECSTATE
WASHINGTON

Maulana Maudoodi, leader of Jamaat-i-Islami, arrested Mar 28 during anti-Ahmadiya agitation in Lahore, found guilty of complicity in riots by military tribunal May 11, and sentenced to death.

Maudoodi, one of leading Pak mullahs, was described at the time of his arrest to Emb officer by both FonSec and Defense Secy as one of "most dangerous men in Pak". Whether or not rpt not sentence will ever be carried out remains be seen. It possible that due public pressure GovGen may commute sentence.

EMMERSON

CDW
CDWithers/jmr

Distribution:
File & Action
Binder

CONFIDENTIAL-SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

T-1711 to DEPT

350.1 PAK - Jamaat-I-Islam - MAUDOODI, Maulana

5/12/53